সিরিয়া ধ্বংসের নেপথ্য-নায়ক

আসাদ পরিবারের ভয়ংকর দুঃশাসন
থেকে আরব বসন্ত ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ

স্যাম ডেগার | শাহেদ হাসান
অনূদিত

সিরিয়া ধ্বংসের নেপথ্য-নায়ক

আসাদ পরিবারের ভয়ংকর দুঃশাসন
থেকে আরব বসন্ত ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা/০৮

অনুবাদকের ভূমিকা/১০

এবার তোমার পালা, ডাক্তার	১৩
শূন্য থেকে আকাশে	৩২
অন্ধকারের সূর্যোদয়	৪৬
সোনালী যোদ্ধা	৭০
নয়া উত্তরসূরীর খোঁজে	৯৫
জঙ্গলে নতুন রাজা	১১৬
ঝোপ বুঝে কোপ	১৪৫
অপরিহার্য ব্যক্তি	১৮৪
মা ফি খাওফ... বা'দাল ইয়াওম...	২১৪
ষড়যন্ত্র	২৪৩

শান্তি কি ফিরবে?	২৫৯
উত্তপ্ত সিরিয়া	২৭৯
হামা ম্যানুয়াল	৩১৩
ইয়াল্লা এরহাল ইয়া বাশশার!	৩৩৩
বয়কট কসাই! বয়কট স্বৈরাচার!!	৩৫৬
রক্তাক্ত হাত	৩৭১
জয় হবে আমাদের!	৩৮৮
প্রস্থান	৪০৫
এখানে তোমার জায়গা নেই	৪২৩
বিদ্রোহ থেকে ধর্মযুদ্ধ	৪৪৪
গোষ্ঠীর রক্ষক ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা	৪৬২
ভয়ংকর রাজ্যাভিষেক	৪৯২
দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ	৫২১

আবু আলি পুতিন ৫৩৭

দায়েশ না বাশার? ৫৬৪

স্বৈরাচাররা ফিরে আসে, তবু নেভে না আশার প্রদীপ ৫৮৮

প্রকাশকের কথা

সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্নিহিত চরিত্র বুঝতে সিরিয়া অধ্যয়ন করা নিঃসন্দেহে জরুরি। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, স্যাম ডেগারের Assad or We Burn the Country: How One Family's Lust for Power Destroyed Syria পড়তে গিয়ে এই সময়ের একজন পাঠক সিরিয়ার চেয়ে বাংলাদেশকেই যেন বেশি খুঁজে পাবেন।

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। একুশ- বাইশ সালের দিকেই আমরা এটি বাংলায় অনুবাদ করার কথা ভাবতে শুরু করি। কিন্তু দুটি কারণে তখন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। প্রথমত, এর বিশাল কলেবর; দ্বিতীয়ত, গল্পের ট্র্যাজিক সমাপ্তি। কলেবরের বিষয়টি তো পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন। আর ট্র্যাজিক সমাপ্তির দিকটি হলো—২০১৮ সালে যখন লেখক বইটি শেষ করেন, তখন বাশার আল আসাদ অভূতপূর্ব দমন-পীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সিরিয়ার রক্তাক্ত বিপ্লবকে প্রায় পুরোপুরি গিলে ফেলেছেন। ২০২২-২৩ সালেও পরিস্থিতির কোনো বদল হয়নি। আমরা যারা আরব বসন্তের শুরু থেকেই খোঁজখবর রাখছিলাম এবং বিশেষত সিরিয়ার বিপ্লবের একটি হ্যাপি এন্ডিং তথা সুন্দর সমাপ্তির জন্য বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম, তাদের কাছে এটি ছিল গভীর হতাশার বিষয়। এই ট্র্যাজিক সমাপ্তিটাই এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বইটির অনুবাদে আগ্রহ কমিয়ে দেয়।

কিন্তু ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ইতিহাস এক আশ্চর্য মোড় নেয়। সাবেক আল কায়েদা নেতা আহমাদ আশ শারার নেতৃত্বাধীন হায়আত তাহরির আশ শামের যোদ্ধারা এক ঝটিকা অভিযানে দামেস্ক দখল করে নেয়, আর বাশার আল আসাদ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা হঠাৎ করেই বইটির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য আগের

যেকোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি তখন এতটাই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি যে, নিজেই এটি অনুবাদে বসে যাই। প্রথম পাঁচটি অধ্যায় করার পর ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় অনুবাদকের দায়িত্ব শাহেদ হাসান ভাইকে হস্তান্তর করি।

আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে বইয়ের অনুবাদ চলাকালীন সময়েই। বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করে ইতিহাসের অন্যতম অবিস্মরণীয় জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান। দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনের অন্ধকার অধ্যায় পেরিয়ে মানুষ অর্জন করে মুক্তি। বিস্ময়ের সঙ্গে তখন আমরা লক্ষ্য করি, এই নতুন প্রেক্ষাপট বইটির তাৎপর্যকে আমাদের পাঠকদের জন্য আরও গভীর করেছে। কারণ প্রায় একই সময়ে সিরিয়া ও বাংলাদেশের জনগণ ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতায় অংশীদার হলো। অবশ্যই সিরিয়ার মানুষকে বহুগুণ বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, কিন্তু উভয় দেশের ফ্যাসিস্ট শাসকের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার কূটকৌশল এবং উভয় দেশের বিপ্লবের সূচনালগ্ন এত বেশি মিল যে, এই সময়ের একজন বাংলাদেশি পাঠক এই বইতে যেন নিজের দেশকেই আবিষ্কার করবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, রাজনীতি নিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশের পর যখন আমরা এই গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি, তখন দৃঢ়ভাবে মনে হচ্ছে—এখন পর্যন্ত আমাদের প্রকাশনার ইতিহাসে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট বই। আশা করি, এত বড় কলেবরের একটি নন-ফিকশন বই হাতে নিয়ে পাঠক একবার পড়া শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত তা নামাতে পারবেন না—এবং তখনই এই কথার সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

বিনীত

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

অনুবাদকের ভূমিকা

স্যাম ড্যাগারের Assad or We Burn the Country গ্রন্থে সিরিয়ার ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি আধুনিক স্বৈরাচারের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবিও ফুটে উঠেছে। কীভাবে ক্ষমতার লোভ ও দুর্নীতি একটি জাতিকে ধ্বংসের অতলে ঠেলে দেয়, তা গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে উন্মোচিত হয়েছে।

সিরিয়ার ইতিহাস বা আসাদ পরিবার সম্পর্কে এই গ্রন্থ অনুবাদের আগে আমার তেমন বিস্তৃত জানাশোনা ছিল না। কিন্তু আসাদ পরিবারের গল্প পড়তে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে, এখানে আমি শুধু বাশার আল-আসাদকেই দেখছি না, বরং পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে গজিয়ে ওঠা স্বৈরাচারের টেমপ্লেটও খুঁজে পাচ্ছি। সব স্বৈরশাসকের মধ্যেই একটি সাধারণ চারিত্রিক বিন্যাস ও কর্মপদ্ধতি পাওয়া যায়। সেই একই রূপরেখা আমরা দেখেছি হাফেজ আল-আসাদ ও তার পুত্র বাশার আল-আসাদের মধ্যে, যা আমাদের নিকট অতীতের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গেও মিলে যায়।

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে দমন করা, গুম-খুন-অত্যাচারের মাধ্যমে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করা, ভিন্নমতের মানুষদের 'সন্ত্রাসী' বা 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে চিহ্নিত করা, প্রকাশ্যে গণহত্যা চালিয়েও সেগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া—এসব কৌশল আমাদের কাছেও অচেনা নয়।

তাদের কৌশল ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত ও হিসেবি। প্রথমে তারা পরিকল্পিতভাবে শান্তিপূর্ণ ও ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনকারীদের দমন করত—যাতে শুধু উগ্রপন্থীরাই টিকে থাকে। এরপর সেই উগ্রপন্থীদের দমনের নামে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর আড়ালে নিজেদের সব নৃশংসতাকে বৈধতা দিত। 'হামা

ডকট্রিন' নামে পরিচিত এই কৌশল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সিরিয়ার মাটিতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এভাবে তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারত—সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদেরও শেষ করত, আবার আমেরিকাকে বোঝাত যে উগ্রপন্থা দমন করতে একমাত্র তারাই সক্ষম।

তবুও এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও বইটিতে প্রতিরোধের এক অদম্য কাহিনি উঠে এসেছে। যখন রাষ্ট্র সব কেড়ে নেয়, তখন সাধারণ মানুষই হয়ে ওঠে প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় শক্তি। গ্রন্থটির একদম শেষের দিকে এক সিরিয়ান নারীর উক্তি ছিল এরকম: "তারা আমাদের কবর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা জানত না যে আমরাই বিপ্লবের বীজ।"

বইটির কাঠামো যেন একটি দীর্ঘ অনুসন্ধানী যাত্রার মতো। এখানে শুধু যুদ্ধের ভয়াবহতার বিবরণ নেই; রয়েছে সিরিয়ার সাধারণ মানুষ, বাস্তুচ্যুত শরণার্থী, দলত্যাগী সামরিক কর্মকর্তা এবং আসাদ সরকারের অন্দরমহলের বহু গোপন সূত্রের বয়ান। বছরের পর বছর ধরে তাদের সঙ্গে কথা বলে ও নথিপত্র ঘেঁটে লেখক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

সিরিয়ানদের দীর্ঘ ও কঠিন সফরের ফসল আজকের এই গ্রন্থ। গ্রন্থটি অনুবাদের তাওফিক দেওয়ার জন্য আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে এই কাজটি সম্পন্ন করার শক্তি দিয়েছেন। এরপর ধন্যবাদ জানাই সিরিয়ার সেইসব সাহসী মানুষকে, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লেখকের সঙ্গে কথা বলেছেন ও তাদের গল্প ভাগ করে নিয়েছেন। তাদের সবার নাম প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু তাদের ছাড়া এ গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। অবশ্যই গ্রন্থটির লেখকের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরিবার, বন্ধু, সম্পাদকমণ্ডলী এবং প্রকাশনা সংস্থা ফাউন্টেনের কর্ণধার আবদুর রহমান আদ-দাখিল ভাইয়ের প্রতি—তার সমর্থন ছাড়া এ বিশাল গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ করা সম্ভব হতো না।

এই অনুবাদগ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকরা সিরিয়া, বিশেষ করে আসাদ পরিবারের ইতিহাসকে আরও কাছ থেকে জানতে পারবেন, স্বৈরাচারের রূপরেখা চিনতে পারবেন এবং নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে তার আলোকে

বিচার করতে পারবেন। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—ক্ষমতার লোভের আগুন কখনো একটি দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা অঙ্গারের মতো ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পৃথিবীতে। আমরাও, বাঙালিরা, নিকট অতীতে এর সাক্ষী হয়েছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন বিশ্বের সব মজলুম মানুষকে স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি দেন এবং পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন।

শাহেদ হাসান
২৫/০৯/২৫
রাজশাহী

এবার তোমার পালা, ডাক্তার!

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারির এক সকাল। দামেস্কে তখন বসন্তের পরশ লেগেছিল। শহরটা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পাচ্ছিল। সেই সকালে তিশরিন প্রাসাদের আঙিনায় বাশার আল-আসাদ টেনিস খেলতে নেমেছিলেন তার বন্ধু এবং সেনাবাহিনীর জেনারেল মানাফ তালাসের সাথে। আশপাশের তিশরিন পার্কে নতুন ঘাস বোনা হয়েছে। গাছপালার লম্বা ডালপালাও ছাঁটা হয়েছে। প্রাসাদের ভেতর মাটির তৈরি ছোট্ট টেনিস কোর্টটি ঘিরে ঘন সবুজ বনানী। বিদেশি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য এই জায়গাটা প্রায়ই ব্যবহৃত হতো। কোর্টের ওপরে প্রায় তিনশো ফুট উঁচুতে বিশাল সিরীয় পতাকাটি বাতাসে দুলছিল। গত জুলাইয়ে এটি লাগানো হয়েছে। সেই সময় বাশারের ক্ষমতায় আসার দশ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়। পার্কে আয়োজন করা হয়েছিল বিশাল জমকালো অনুষ্ঠান। স্কুলের শিশুরা গেয়েছিল দেশাত্মবোধক গান। হাতে ছিল লাভ (Love) আকৃতির কাগজে আঁকা বাশারের মুখ। বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট।

তবে সেদিনের খেলায় বাশার যেন কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলেন। অবসরে প্রায়শই ছয় ফুটের বেশি লম্বা, ছিপছিপে ও সুগঠিত বাশার টেনিসে মেতে থাকেন। এটি তার জন্য ছিল একঘেয়ে রাষ্ট্রপতির জীবন থেকে সামান্য বিরতি। তার নীল চোখে থাকে দৃঢ় দৃষ্টি। সার্ভগুলোও হয় প্রবল। কিন্তু আজ তিনি যেন উদাসীন, খেলার মধ্যে মন নেই। মানাফ টের পেলেন কিছু একটা ঠিক নেই। বলটাকে র‍্যাকেট দিয়ে আঘাত করলেন মানাফ—ঠাস! ঠিক সেই মুহূর্তে কোর্টের ওপরে থাকা বিশাল পতাকাটি বাতাসের ঝাপটায় বিকট শব্দে উড়ে উঠল। মনে হলো যেন আকাশে বজ্রপাত হলো। হঠাৎ চমকে উঠলেন বাশার। হাতে ধরে থাকা র‍্যাকেট ছুটে পড়ে গেল মাটিতে।

'শান্ত হও, ভয়ের কিছু নেই,' হাসিমুখে বললেন মানাফ, বন্ধুর মন শান্ত করার চেষ্টা করলেন তিনি। বাশার হালকা হেসে ঘাড় নাড়েন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা আবার খেলায় ফিরে গেলেন। কিন্তু সেদিনের সেই শীতে বাশারের ভয়ের কারণ কম ছিল না। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় এক গণজাগরণে

ক্ষমতাচ্যুত হয় এক স্বৈরশাসক। দীর্ঘদিন ধরে তার দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনকে পশ্চিমা বিশ্ব ও আরব উপদ্বীপের তেলসমৃদ্ধ রাজতন্ত্রগুলো সমর্থন দিয়ে আসছিল। তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনী শাসকের পক্ষ ছেড়ে জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল মিশরে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভ। যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত দীর্ঘদিনের শাসক, যিনি তার ছেলেকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৈরি করছিলেন, তিনিও এই বিক্ষোভের মুখে টলছিলেন। মিশর আর তিউনিসিয়ার মাঝখানে অবস্থিত লিবিয়াও তখন বিদ্রোহের দ্বারপ্রান্তে ছিল। দেশটির শাসনক্ষমতা ছিল এক প্রাক্তন উন্মাদ সেনা কর্মকর্তার হাতে, যিনি লৌহমুষ্টিতে দেশ শাসন করছিলেন। এদিকে সৌদি আরবের রাজপরিবারও ভয়ে শঙ্কিত ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসকদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবের নজর ছিল তাদের দক্ষিণের প্রতিবেশী দরিদ্র দেশ ইয়েমেনের দিকে, যেখানে বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল। একইসঙ্গে তাদের তেলক্ষেত্রের পাশের ছোট দ্বীপরাষ্ট্র বাহরাইনেও প্রতিবাদে কাঁপছিল সেখানকার রাজপরিবার।

আরবের শাসকেরা যেন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শহরের রাস্তায় মুক্তি আর স্বাধীনতার মিছিল ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল জনগণের ইচ্ছার সামনে কিছুই টিকে থাকতে পারবে না। কেউ কেউ এই ঘটনাকে তুলনা করছিলেন ১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়া এবং পরবর্তীতে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসনগুলো একে একে ধসে পড়ার সাথে। ধারণা ছিল, পূর্ব ইউরোপের মতোই আরব বিশ্বের কঠোর স্বৈরাচারী শাসনগুলোও একে একে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। বহু আকাঙ্ক্ষিত হুররিয়াত বা স্বাধীনতা ছড়িয়ে পড়বে মরুভূমির বুনো ফুলের মতো, যেমনটি তখন দামেস্কের আশপাশে শীত শেষে ফুটতে শুরু করেছিল। এ যেন এক আরব বসন্ত। অনেকেই ধরে নিয়েছিল, এবার পালা আসাদ পরিবারের। কিন্তু আসাদ পরিবারের শক্তিমান রক্ষাকর্তারা বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখেছিল। বাশারের হাতে আসা একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে পরিষ্কার বলা ছিল— 'সিরিয়ায় এরকম কিছু ঘটবে না... সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে... সিরিয়া এই অস্থিরতা থেকে মুক্ত।'

এসব আশ্বাস বাশারের মনে শান্তি ফেরানোর জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা ছিল। সিরিয়ার পুলিশি রাষ্ট্রব্যবস্থার মেরুদণ্ড ছিল এই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এবং তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। এই সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে পরিচিত ছিল 'মুখাবারাত' নামে। আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করা এই শক্তিশালী বাহিনী সেনাবাহিনী, সরকার,

২

শূন্য থেকে আকাশে

আসাদ এবং তালাস পরিবারের সেই যাত্রা—যা তাদের ও তাদের দেশকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল—শুরু হয়েছিল প্রায় ছয় দশক আগে। ১৯৫২ সালের শরৎকালে হোমস শহরের সামরিক একাডেমিতে হাফেজ আল-আসাদ এবং মুস্তাফা তালাসের প্রথম পরিচয় হয়।

সিরিয়া তখন ফরাসি উপনিবেশ থেকে সদ্য স্বাধীনতা লাভ করার পর সামরিক অফিসারদের কর্পস গড়ে তোলার জন্য উদগ্রীব ছিল এবং স্বেচ্ছাসেবীদের আহ্বান জানাচ্ছিল। দরিদ্র, সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের জন্য এটি ছিল একটি ভালো সুযোগ। নবম শ্রেণি পাস করা যে কেউ একটি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সেখানে যোগ দিতে পারত। ক্যাডেটদের থাকা-খাওয়া এবং মাসিক ভাতা দেওয়া হতো।

হাফেজ ছিলেন মেধাবী এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস। তিনি চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারতেন, কিন্তু তার বড় পরিবারের জন্য তা ছিল কষ্টসাধ্য। আসাদ পরিবার ছিল আলাভি সম্প্রদায়ের, সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় তাদের বসবাস। আলাভিরা শিয়াদের একটি শাখা হিসেবে বিবেচিত হলেও মূলধারার অনেক মুসলিম তাদের 'বিধর্মী' বলে আখ্যায়িত করতেন এবং তারা ইতিহাসজুড়ে নিপীড়িত হয়েছে। হজরত আলীর রা. প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং সমাজে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা তাদেরকে শিয়াদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। তবে আলাভিরা নিজেদেরকে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক বলে মনে করে। তাদের কিছু বিশ্বাসের উৎস খ্রিস্টধর্মে পাওয়া যায়। তবে সাধারণত তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনগুলো রহস্যে ঘেরা, যা শত্রুদের কবল থেকে তাদের রক্ষা করলেও কখনো এটিকেই শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

ফরাসি শাসনের সময় আলাভি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল ফরাসিদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির অংশ।

এভাবে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করেছিল। স্বাধীনতার পর সিরিয়া আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ঐতিহ্যগত প্রভাবের কারণে এটি ছিল চ্যালেঞ্জপূর্ণ। তখনও দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল শহুরে অভিজাতদের হাতে, যারা মূলত ছিলেন সুন্নি মুসলিম বা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের। তখনকার সিরিয়ার সমাজে ছিল তীব্র বৈপরীত্য। বড় শহরের নারীরা প্যারিসের সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্যাশন অনুসরণ করে কলেজে যেত এবং অফিসে কাজ করত। অন্যদিকে শহরতলির নারীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে ঘরকন্নার কাজ করত এবং মাটির কলসিতে পানি আনত। মুস্তাফা ছিলেন সুন্নি মুসলিম, তবে হাফেজের মতো তিনিও একটি সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের সন্তান। তিনি হোমস অঞ্চলের আল-রাসতানের একজন কৃষকের ছেলে। সেখানে গ্রামের মানুষরা জমি চাষ করতেন এবং ভেড়া পালন করতেন। আল-রাসতানের অন্যান্য নারীদের মতো মুস্তাফার মা-ও শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ওরন্টেস নদীর তীরে বসে কাপড় ধুতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তালাস পরিবার এতটাই দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, মুস্তাফার বাবা তাদের পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে দেন এবং ছোট একটি বাড়িতে চলে যান, যেখানে তিনি টিকে থাকার জন্য একটি স্নানঘরের ব্যবসা শুরু করেন। মুস্তাফা তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হন, তবে দক্ষিণ সিরিয়ার একটি গ্রামে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে কাজ পান। তার বেতন ছিল সামান্য, আর থাকার জন্য ছোট একটি কক্ষ বরাদ্দ ছিল। এরপর তিনি সামরিক একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ একজন অফিসার হওয়া তার মতো কারও জন্য সামাজিক মর্যাদা অর্জনের একটি ভালো সুযোগ, এমনকি ক্ষমতা এবং খ্যাতির শিখরে পৌঁছানোর একটি টিকিটও। ১৯৫২ সালের গ্রীষ্মে, ঠিক হাফেজ এবং মুস্তফা যখন একাডেমিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন গোটা আরব বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল জামাল আবদেল নাসেরের উত্থান। এই যুবক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তার সহকর্মী অফিসারদের নিয়ে, মিসরের পশ্চিমা-সমর্থিত রাজা ফারুককে উৎখাত করেছিলেন। এই অফিসাররা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তারা আরবদের ঐক্যবদ্ধ করবেন, সদ্য গঠিত ইহুদি রাষ্ট্র থেকে ফিলিস্তিনকে পুনরুদ্ধার করবেন এবং সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক অতীতের সকল চিহ্ন মুছে ফেলবেন। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনাময় বক্তব্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

৩

অন্ধকারের সূর্যোদয়

গোঁফওয়ালা জেনারেল এবং তার অনুসারীরা এসে দাঁড়ালেন এক পতাকা দণ্ডের সামনে, যেখানে পতাকাটি অর্ধনমিত অবস্থায় দুলছিল। লাল, সাদা, কালো এবং মাঝখানে একটি বাজপাখির প্রতীক খচিত পতাকাটি তুলে ধরলেন জেনারেল, তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। তারপর, গভীর শ্রদ্ধায় সেটি ঠোঁটে চুম্বন করলেন।

'হাফেজ! হাফেজ! হাফেজ!' জনতা উন্মত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

১৯৭৪ সালের জুন। হাফেজ আল-আসাদ তখন চল্লিশের ঘরে। খাকি সামরিক পোশাক, মাথায় সামরিক ক্যাপ, পায়ে কালো চামড়ার জুতো। তার কাঁধের ব্যাজে বাজপাখি, দুটি তারা এবং দুটি ক্রস তলোয়ার। তিনি শুধু সেনাবাহিনীর প্রধান বা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নন, বাথ পার্টির মহাসচিবও। আর এখন তিনি হয়ে উঠছেন জীবন্ত কিংবদন্তি—সর্বোচ্চ নেতা, জাতির পিতা, আরবদের রক্ষক। তবে এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার আরেকজনও ছিলেন। পাশের দেশ ইরাকের নেতা সাদ্দাম হোসেইন, বাথ পার্টির আরেকটি শাখার ছত্রছায়ায় একই গৌরবের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেদিন হাফেজের পাশে ছিলেন তার বিশ্বস্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুস্তাফা তালাস। তাদের সঙ্গে ছিল দুই কিশোর—একই ধরনের ছোট ছোট চুল, খাকি পোশাক। একজন হাফেজের পুত্র বাসেল, আরেকজন মুস্তাফার পুত্র মানাফ। তাদের বন্ধুত্ব স্বাভাবিক নয়; বরং এটি হাফেজের ইচ্ছার ফসল।

একজন অফিসার হাফেজের ওপর ফুল ছিটিয়ে দিলেন, আর জনতার করতালি ও উল্লাসের মাঝে তিনি পতাকা উত্তোলন করলেন। বাসেল ক্যামেরা হাতে মুহূর্তগুলো ধরে রাখল। তার বাবা ও চারপাশের উচ্ছ্বাসময় দৃশ্যগুলো বারবার ফ্রেমবন্দি হলো। হাফেজ ও মুস্তাফা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকাকে সালাম জানালেন। দুই দশক ধরে তারা এই দিনটির স্বপ্ন দেখেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, চক্রান্ত আর রক্তমাখা পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে আজ তারা এই শিখরে।

পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন হাফেজ। দুপাশে তার সন্তানেরা তাকিয়ে আছে উৎসুক চোখে। কাগজ খুলে তিনি ভাষণ শুরু করলেন।

‘জনগণের ইচ্ছাশক্তিকে কখনো দমন করা যায় না... আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, আমাদের প্রতিটি ইঞ্চি দখলকৃত আরব ভূমি পুনরুদ্ধার করতে হবে...’ কাছের ক্যামেরাগুলো এই চিত্র ধরে রাখল। শাসক দলের দাবি, সেদিন হাফেজের ভাষণ শুনতে ৩০০-এর বেশি বিদেশি সাংবাদিক হাজির হয়েছিলেন। ‘এই জনগণ চিরকাল স্বাধীনতা এবং মর্যাদার দীপ্তি ছড়াবে,’ ভাষণের শেষে বললেন হাফেজ। দলীয় কর্মকর্তা, সেনারা এবং সাধারণ সিরিয়ানরা ইতিহাসের এই মুহূর্তকে নিজের চোখে দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। গ্রামের কৃষকরা মাথায় লাল-সাদা চেকের কোফিয়া আর নারী-শিশুরা তাদের মেয়েলি রঙিন পোশাকে ভিড় জমিয়েছে। কেউ এসেছে ডাম্প ট্রাকের পেছনে গাদাগাদি করে, কেউবা পায়ে হেঁটে। তাদের গন্তব্য ছিল কুনেইত্রা—একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর, দামেস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে গোলান মালভূমির কিনারায়। ভাষণ শেষে মুস্তাফা তার ছেলে ও বাসেলের দিকে ফিরে বললেন, ‘তোমরা যখন বড় হয়ে অফিসার হবে, তখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়বে।’ তার চোখে গর্ব ঝলমল করছে।

সেই দিনটিকে ‘জাতীয় মুক্তির দিন’ নামে অমর করে রাখা হলো। হাফেজ হয়ে উঠলেন ‘তিশরিনের নায়ক’। তার নেতৃত্বে সিরিয়ান সেনাবাহিনীর বীরত্বগাঁথা স্কুলের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত হলো। প্রতি বছর তা উদ্‌যাপন করা হবে। ‘আমাদের জনগণ মুক্তির আনন্দ উদ্‌যাপন করছে,’ পরদিন শাসক দলের দৈনিক পত্রিকায় শিরোনাম হলো। কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল মুক্তির নামে এক বীভৎস মিথ্যা গল্প, যা আসাদ পরিবার সামনের দিনগুলোতে ব্যবহার করবে পুরো সিরিয়াকে দমিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে। এর ঠিক এক বছরেরও কম সময় আগে, ১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর হাফেজ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মিশরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান মালভূমিতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। তখন মিশরের নেতৃত্বে ছিলেন আনোয়ার আল-সাদাত। শুরু থেকেই এই দুই নেতার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাদাত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে চেয়েছিলেন এবং চূড়ান্তভাবে ইসরাইলের সঙ্গে এমন একটি চুক্তি করতে আগ্রহী ছিলেন, যার মাধ্যমে সিনাই উপদ্বীপ পুনরুদ্ধার করে মিশরের কাছে ফিরিয়ে